রাজা রামমোহন রায়

চিন্তা ও গদ্যচর্চা

সৈয়দ মবনু

ঐতিহ্য

কিছু কথা

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের একুশে গ্রন্থমেলায় ওয়ালি মাহমুদের সম্পাদিত 'লোকন' লিটলম্যাগে 'রাজা রামমোহন রায়, তাঁর চিন্তা ও গদ্যচর্চা' শীর্ষক এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থিত করে প্রকাশ করতে বেশ সময় লাগল। তবু বানানে ভুল থাকলে, দুঃখিত। তথ্যগত ভুল যাতে না থাকে সেই চেষ্টা করেছি, যদি থাকে তবে ক্ষমাপ্রার্থী। জানালে আগামীতে সংশোধনের চেষ্টা করব।

সৈয়দ মবনু
সিলেট, ২০২৫

রাজা রামমোহন রায়
জন্ম, পরিবার, শিক্ষা এবং চিন্তার প্রকাশ

রাজ্য নেই, তবু তিনি রাজা। নাম রামমোহন রায়। চিন্তক ছিলেন। তিনি রাজা ছিলেন মূলত চিন্তা জগতের। শুধু তাঁর সময়ের নয়, আজকেরও একজন শক্তিমান চিন্তক হিসেবে তিনি সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর সব চিন্তা কিংবা কথার সাথে আমরা একমত না হতে পারি, তবে তিনি শক্তিমান চিন্তক ছিলেন, তাতে কমপক্ষে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। তিনি যে সময়ে, যে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করেছেন, সেই সময়ের সমাজকে বিবেচনা করলে তাঁকে তাঁর সমাজের একজন সংস্কারকও বলা যায়। ভারতের হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহনের জন্ম। জন্মের বছর নিয়ে কিছু মতানৈক্য আছে—কেউ লিখেছেন, ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ আর কেউ লিখেছেন, ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। উভয়ের মতে জন্ম তারিখ—২২ মে। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের চাকরিতে থাকাকালীন সময়ে নিজ দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে 'রায়-রায়ান' উপাধি লাভ করেছিলেন। আর তখন থেকে এই পরিবারের সদস্যরা 'রায়' উপাধি ব্যবহার করে আসছেন। রামমোহন রায়ের দাদা ব্রজবিনোদ ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার অধীনে কর্মরত। তাঁর বাবা রামকান্ত প্রথমে ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের অধীনে চাকরিরত। পরে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে তালুক ইজারা নিয়ে স্বাধীনভাবে বৈষয়িক কর্ম করতে থাকেন। রামকান্তের ছিল তিন স্ত্রী। এরমধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী 'তারিণীদেবী' ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের মা। তাঁকে রায় পরিবারে 'ফুলঠাকুরানি' বলে ডাকা হতো। গবেষকদের মতে, রাজা রামমোহনের মধ্যে ছিল তাঁর পিতার বিষয়-বুদ্ধি আর মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা। রাজা রামমোহন রায়ের পরিবার কিংবা বংশ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় তাঁর গদ্যচর্চা, চিন্তা এবং কর্ম। যেহেতু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, তাই তাঁর চিন্তায় হিন্দু ধর্মশিক্ষার প্রভাব

জন্মসূত্রে থাকাটা অযৌক্তিক নয়। নাস্তিক বলেন কিংবা আস্তিক, ধর্মশিক্ষা দিয়ে সাধারণত পাক-ভারত-বাংলার বেশিরভাগ মানুষের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। রাজা রামমোহন রায়ও নিজ বাড়িতে গুরু মশাইয়ের অধীনে শুভংকরী পাঠের মধ্যদিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল মূলত তিনটি— পাঠশালা, টোল, মক্তব। রামমোহন তাঁর পরিবারের ইচ্ছানুসারে বাল্যকালে এই তিন শিক্ষাই অর্জন করেছিলেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য মক্তবে পড়াটা বেশ বৈচিত্র্যময়। কিন্তু রামমোহনের সময়ে এমনটি ছিল না। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পরিবারের যারা সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন তাদের পরিবারে আরবি-ফারসি শিখার বিশেষ আগ্রহ ছিল। রামমোহন রায় পারিবারিক প্রথানুসারে মক্তবে আরবি-ফারসি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে ভারতীয় হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের প্রথা চালু ছিল। রামমোহনকে আট বছর বয়সে প্রথম বিবাহ করানো হয়। অল্পদিনের ভেতর তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা গেলেন। তাঁর পিতা রামকান্ত তাঁকে এ বছর (১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে) শ্রীমতি দেবীর সাথে দ্বিতীয় বিবাহ এবং পরের বছর (১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে) উমাদেবীর সাথে তৃতীয় বিবাহ করিয়ে দেন। বড়বউ, ছোটবউ বলে তারা পরিবারে পরিচিত ছিলেন। বিয়ে এবং প্রাইমারি শিক্ষা শেষে রামমোহন উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথমে পাটনায় যান। পাটনা ছিল সেই সময়ে আরবি-ফারসি এবং ইসলামি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। পাটনায় থেকে রামমোহন আরবি-ফারসি ভাষার পাশাপাশি পাঠ করেন ইসলামি সাহিত্য, ফেকাহ, কুরআন এবং মুসলিম সুফি-সাধকদের বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থ। পাশাপাশি তিনি আরবি-ফারসি ভাষায় পাঠ করেন ইউক্লিড এবং এরিস্টটলের দার্শনিক গ্রন্থ। রামমোহনের জীবনীকারকরা লিখেছেন, 'ইসলামিক শিক্ষা কিশোর রামমোহনের চিন্তাজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। কুরআনই তাঁর ধর্মবিশ্বাসে সর্বপ্রথম এনে দিয়েছিল একটা বিরাট পরিবর্তন। এই ধর্মগ্রন্থ থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস যা তিনি লাভ করেছিলেন তা সম্ভবত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। মোটকথা, ইসলাম ধর্মের উদারতা তাঁর কৈশোর জীবনেই গভীর ছায়াপাত করেছিল।' (জীবনী, রামমোহন রচনাবলী, সম্পাদক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ, ১৪ প্রপ্রিল ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ, হরফ প্রকাশনী, পৃ. ৫৮৩)।

পাটনায় লেখাপড়া শেষে রামমোহন রায় কাশীতে গেলেন। কাশী ছিল তখন হিন্দুধর্মের প্রসিদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নকেন্দ্র এবং তীর্থস্থান। রামমোহন এখানে সংস্কৃত ভাষা শিখে অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান আর্যশাস্ত্রের

জ্ঞান অর্জন করেন। রামমোহন কুরআন পাঠকালে এক আল্লাহর বর্ণনা পেয়ে যে আলোড়ন মনে অনুভব করেছিলেন, বেদান্তর পাঠের পর এক ব্রহ্মের কথা পেয়ে আরো আলোড়িত হলেন। ইসলামের মৌলিক কথা হলো—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আর হিন্দু উপনিষদে বলা হয়েছে– 'একমেবাদ্বিতীয়ম।' অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ছাত্র জীবনে এই দুই ধর্মের মূল মন্ত্র 'একেশ্বরবাদ' রামমোহনের ভেতরে এক নতুন চিন্তার জন্ম দিলো। এই চিন্তা মাথায় নিয়ে তিনি ফিরে এলেন নিজ গ্রাম রাধানগরে। এই চিন্তাকে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্যই তাঁর প্রয়োজন হলো গদ্যচর্চার।

আমরা এতক্ষণ যে কথাগুলো আলোচনা করেছি তা মূলত রামমোহন রায়ের গদ্য এবং চিন্তায় আসার জন্য। রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা ছিল ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে। চিন্তাগুলো ছিল মৌলিক এবং ধর্মীয়। রাজা রামমোহন রায় মুসলমান কিংবা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী না হলেও তাঁর চিন্তাকে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তিনি কুরআনিক বর্ণনা থেকে ইসলামের মৌলিক তিনটি উদ্দেশ্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন—

১. নিজের প্রতি কর্তব্যবোধ;
২. জনগণের প্রতি কর্তব্যবোধ;
৩. পরমেশ্বরের প্রতি কর্তব্যবোধ।

তাঁর একেশ্বরবাদের চিন্তা মূলত নিজের গবেষণার ফসল। তিনি মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কথা বলতেন, কিন্তু নিজের আদর্শকে উপেক্ষা করে তিনি কোনো প্রকারের ঐক্যের চেষ্টা করেছেন বলে আমরা তাঁর জীবনীতে দেখতে পাই না। মূলত তাঁর ঐক্যের বাণী ছিল শুধু সুন্দরের পক্ষে। তিনি নিজেও বলতেন—'পরমেশ্বর দয়াময়, সুতরাং তিনি তাঁর জীবগণের কল্যাণের ইচ্ছা করেন। যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। সুতরাং জীবের হিতসাধন ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিয়ম। ইহাই পরম ধর্ম।' (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামমোহন রচনাবলী, পৃষ্ঠা-৭৩০, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা)। তিনি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পড়েছেন, আহরণ করেছেন বিভিন্ন ধর্মের সুন্দরকে, কিন্তু বেরিয়ে যেতে চাননি নিজ হিন্দুধর্ম থেকে। বরং তিনি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে আজীবন গলায় পৈতা বেঁধে এখানে সংস্কারের চেষ্টা করেছেন।

রাজা রামামোহন রায় অনেকটা শ্রীচৈতন্যের মতোই সংস্কারক ছিলেন। দুজনের পথ-পদ্ধতি ভিন্ন হলেও তাঁরা ছিলেন হিন্দুধর্মের বুদ্ধিভিত্তিক রক্ষক।

কিন্তু হিন্দু সমাজপতিরা রামমোহনকে মেনে নিতে পারেননি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—'রামমোহন রায়ের ধর্মবিশ্বাস প্রথমে হিন্দুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তিনি বেদান্ত-দর্শনাদি অনুবাদিত এবং মুদ্রিত করিয়া স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন এবং আত্মীয় সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার করিতেছিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তখন শহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত এক কমিটিতে কার্য করিতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটি হইতে তাড়িত হইয়া নিজে ধর্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলন তো পূর্ব হইতেই চলিতেছিল, ইহার উপরে আবার ১৮২০ সালে রামমোহন রায় যিশুর উপদেশাবলী নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সংস্রবে আসিয়া ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারী মিস্টার উইলিয়াম আডাম খ্রিষ্টীয় ত্রিশ্বরবাদ পরিত্যাগপূর্বক একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণের সঙ্গে রামমোহন রায়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উপর্যুপরি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।' (প্রাগুক্ত)।

একেশ্বরবাদের প্রশ্নে রাজা রামমোহনের সাথে প্রথমে হিন্দু সমাজপতিদের সংঘাত শুরু হয়। এই একই বিষয়ে তাঁর খ্রিষ্টানদের সাথেও প্রচুর সংঘাত হয়েছে। রামমোহন রায় নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু আজীবন যুদ্ধ করেছেন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। হিন্দুধর্মের প্রধান শত্রু তার নিজের শাস্ত্রে তৈরি জাতপ্রথা। এই জাতপ্রথা 'ভগমান মনুর বচন' বলে ব্রাহ্মণরা নিজেদের ফজিলত বর্ণনা করতে তৈরি করলেও মূল উপনিষদে এই সব নেই বলে হিন্দুধর্মের সংস্কারকগণ আজীবন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মণরা যখন মনুর বচন দিয়ে বলেছেন—'ব্রাহ্মণরাই শুধু অমৃতের পুত্র, অব্রাহ্মণরা নয়' তখন সংস্কারকগণ উপনিষদ থেকে উত্তর দিয়েছেন–'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', অর্থাৎ বিশ্বে মানুষই হলো অমৃতের পুত্র। মানুষ অমৃতের পুত্র, না ব্রাহ্মণরা? এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা তাদের ধর্মীয় সমাজে যে রেনেসাঁস শুরু করেছিলেন, এর মূলে যারা জল দিয়েছেন তাদের অন্যতম শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ। ওদের সবার চিন্তা কিংবা কর্মপদ্ধতি এক ছিল না। তবে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কারে তাদের মনের মিল ছিল। মুসলমানরা ভারতে এসে শ্রেণিপ্রথা ভেঙে শুরু করেন মানুষের সাথে অবাধে চলাফেরা। মুসলিম কর্তৃক জাতপ্রথা অমান্য

শুরু হলে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের বিশাল একটি অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর খুব ভাবিত হয়ে হিন্দু চিন্তকরা তা প্রতিরোধের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। এই কৌশলীরাই মূলত হিন্দু সমাজের সংস্কারক। এই সংস্কারকরা প্রায় সবাই তাদের সমাজের সকল অধিকার-ভেদ মেনে বৈষম্যের মধ্যদিয়ে সাম্য এবং স্বাতন্ত্র্যের ভেতর দিয়ে একতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তারা কেউ কেউ আবার প্রথার বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ কেউ সকল ধর্মকে সমান বলে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা-সমালোচনা করে হিন্দু সমাজের মনোজগতে এই কথাটা ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন—'সমান যখন তবে গিয়ে লাভ কী, যেখানে আছ সেখানেই থাক। এখানে যে ভুলগুলো দেখছো, বরং এসো আমরা এসবের সংস্কার করি।' গবেষক সংকর সিংহ শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁর 'শ্রীচৈতন্যও ভাঙতে পারেননি ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন—'ব্রাহ্মণ্যধর্মের অমানবিক জাতিভেদ বৌদ্ধধর্মের বিকৃত তন্ত্রসাধনা, সবকিছু থেকেই মুক্তি চাইছিল সাধারণ মানুষ। এদেশে মুসলিম বিজয়ের পর ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই যে ইসলাম ধর্মের প্রসার লাভ ঘটতে থাকে তা তো এখন ইতিহাস। ইসলাম ধর্ম কীভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় প্রসার লাভ করে তা দেখে নিতে পারি নিচের উদ্ধৃতি থেকে— 'অনুমান করা যেতে পারে তেরো শতকে শতকরা একজন, চৌদ্দ শতকে তিনজন, পনেরো শতকে ছয়জন, ষোলো শতকে বাইশজন, উনিশ শতকের শেষভাগে (১৮৭১) উভয় বঙ্গে শতকরা বত্রিশ জন মুসলমান ছিল।' বিশ শতকে আমরা দেখছি অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। অবশ্য তাদের সকলেই যে শূদ্র থেকে ধর্মান্তরিত তা বলছি না। তবে বাংলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানই যে শূদ্র থেকে রূপান্তরিত তা কেউ অস্বীকার করেন না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খুব কমই ধর্মান্তরিত হয়েছেন। ইসলামের মানবতাবাদ তাদের তেমন আকৃষ্ট করেনি।' (আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন, জানুয়ারি ২০০২, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা–১৫)।

শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কঙ্কর সিংহ আরো বলেন, ষোড়শ শতাব্দীর ভারত রেনেসাঁসের নায়ক শ্রীচৈতন্য যদি পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্ম না নিতেন তবে উভয় বাংলার চেহারা অন্য রকম হয়ে যেত। বাংলার যেসব শূদ্র তখন শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা সবাই চলে যেতেন ইসলামে। শ্রীচৈতন্য শূদ্রদের ধর্মান্তর ঠেকিয়ে মূলত বাংলায় রুদ্ধ করেছিলেন ইসলাম ধর্মের বিস্তার।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭)। রাজা রামমোহন রায় কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম সম্পর্কে

বলেছেন—'যত মত তত পথ।' আমাদের আলোচনার বিষয় ধর্ম নয়, বরং রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু রামমোহন রায়ের চিন্তায় যেতে হলে ধর্মের রাজপথ স্পর্শ করে যেতে হয়, তাই এই ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা। রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদের চিন্তা, সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদিও মূলত ছিল হিন্দুধর্মের মঙ্গলার্থে। রামমোহন তাঁর চিন্তার ভিত তৈরি করেছিলেন মূলত বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে। রামমোহন নিজেই তাঁর নিজের পরিচয় দিচ্ছেন—'সকল ধর্মের সকল বিশ্বাসের মানুষকে ঔদার্য, দয়া করুণা ও নৈতিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে মানুষের মিলনের বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা, এই আমার জীবনের ব্রত।' রামমোহন আজীবন চেষ্টা করেছেন ব্রাহ্মণের সমাজ ভেঙে ব্রাহ্মের সমাজ গড়তে। তাই তিনি গঠন করেছিলেন 'ব্রাহ্মসমাজ' নামক সংগঠন। তাঁর 'ব্রাহ্মসমাজ' পরবর্তীতে একটি নতুন ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেলেও তাঁর দৃষ্টিতে এটা কোনো ধর্ম ছিল না। মূলত তিনি পৃথক কোনো ধর্ম সৃষ্টির চেষ্টাও করেননি। রামমোহনের সারাজীবনের কর্মটা মূলত ছিল তাঁর নিজের সমাজ এবং ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হলেও নিজে ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তিনি এসব ঘৃণা করতেন। রামমোহন রায় খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, বেদ-উপনিষদ-গীতা-স্মৃতি-সংহিতার যে ব্যাপক প্রভাব হিন্দু সমাজ ও ধর্মে তা থেকে শতভাগ বেশি প্রভাব মনুস্মৃতির। ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায়—মনুর বচন উচ্চারণ করে করে হিন্দু সমাজপতি ব্রাহ্মণরা তাদের সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে, নারীদেরকে কবজার ভেতরে বন্দি রাখতে মনুর বচন দিয়ে করে দিয়েছেন ব্রাহ্মণ নারীকে শূদ্রের সমতুল্য আর শূদ্র নারীদেরকে অশাস্ত্রীয়। হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা একটি জঘন্য কুসংস্কার ছিল। কিন্তু এই কুসংস্কারের ভেতরেও মনুর বচনে ছিল বিশাল বৈষম্যনীতি। সতীদাহ প্রথার ফজিলতে বলা হয়েছে—মাতৃকুল, পিতৃকুল, শশুরকুলকে স্বর্গে নিতে ব্রাহ্মণ নারীদের জন্য সহমরণ জরুরি। তবে তা শূদ্র নারীদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। কারণ কী? রামমোহন গবেষণায় আমরা যে কারণ দেখি তা হলো—

১. ব্রাহ্মণরা পছন্দ করেন না, তারা যে স্বর্গে যাবেন সেখানে শূদ্ররাও যাক। তাই তারা শূদ্র নারীর সহমরণ বন্ধ করে তার মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং স্বামীকুলের ব্যাপকহারে স্বর্গে যাওয়ার পথ বন্ধ করা হলো।

২. ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে অন্য কেউ স্পর্শ করুক, তা একজন ব্রাহ্মণ কখনো মেনে নিতে পারত না। কিন্তু শূদ্রের নারীর ক্ষেত্রে ছিল ব্রাহ্মণদের নীতি—গরিবের বউ সকলের ভাবি।

৩. ব্রাহ্মণ নারীরা সহমরণের মাধ্যমে স্বামীর সাথে স্বর্গে যেতে পারত, পারত শুদ্ধাচারিণী হতে, কিন্তু মনুর বচন দিয়ে এসব কিছু থেকে শূদ্র নারীদেরকে বঞ্চিত করা হলো।

রাজা রামমোহন রায় তাঁর গবেষণার শাখা-প্রশাখায় এসবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মূল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, মূল সমস্যাকে উৎখাতের চেষ্টা করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন হিন্দুধর্মের প্রচলিত সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল অনেকটা সম্রাট আকবরের 'দ্বীনে এলাহী'র চিন্তা-চেতনার মতো সকল ধর্মের সমন্বয়ের পক্ষে। তবে 'মতো' হলেও একেবারে একই জিনিস ছিল না, প্রচুর ব্যবধান ছিল দুজনের কর্ম ও চিন্তায়। সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন এবং নিজেকে ফেরাউনের মতো 'আকবর দ্য গ্রেট' ভাবতেন। আর রামমোহন রায় ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, চিন্তক এবং শিক্ষিত। তাই রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ'-কে সম্রাট আকবরের 'দ্বীনে এলাহী' বলা যাবে না। সম্রাট আকবর সকল ধর্ম নিষিদ্ধ করে নতুন ধর্ম সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, আর রামমোহন রায় শুধু শাস্ত্রের ভালো দিকগুলোর সমন্বয়ের কথা বলেছেন, তিনি মূল ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলেননি। রামমোহন হিন্দুধর্মের বহু দেব-দেবীর পূজাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মূলত হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, বরং তিনি চেয়েছেন হিন্দুধর্ম মনুর ভ্রান্ত বচন ছেড়ে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদে ফিরে আসুক। তিনি কৈশোর থেকে আজীবন উপনিষদের-একমেবাদ্বিতীয়ম, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা বলেছেন। তবে তিনি নতুন কোনো ধর্মের জন্ম দিতে চিন্তাও করেননি। শাস্ত্রীয় বিধান 'যবনের ঘরে কিংবা যবনের হাতের খাদ্য গ্রহণ পাপ' তিনি মানতেন না। তাঁর ঘরে যে বাবুর্চি পাক করত সে ছিল মুসলিম। এমন কি তিনি ইংল্যান্ড যাওয়ার সময়ও এই বাবুর্চিকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। (গোলাম মুরশিদ, কালাপানির হাতছানি, বিশেষ রচনা, ঈদসংখ্যা, ঈদুল ফিতর ২০০৭)। তবে সত্য যে, রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দুধর্মের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রকাশ্য ঘোষণা না দিলেও আর ভেতরে থাকেনি। বিশ্ব উপাসনালয় (Church Universal) নামে তারা যে উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আর মন্দির না থেকে অনেকটা খ্রিষ্টানদের চার্চের আদলে হয়ে গেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তার বিকাশ

রামমোহন রায় যে 'ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেছিলেন তা প্রকৃত অর্থে সাংগঠনিক কিংবা ধর্মীয় পূর্ণতা লাভ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান খলিফা বলা যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে আসার পর থেকেই তা হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। অবশ্য পরবর্তীতে 'ব্রাহ্মসমাজ' রামমোহনের আদর্শ-চেতনাকে অবিভক্ত রাখতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষের দিকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে 'ব্রাহ্মসমাজ'। তখনো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা আলাদা হয়ে গঠন করেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ', প্রবীণরা কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে গঠন করেন 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ', আর দেবন্দ্রনাথের নেতৃত্বে থাকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। সমাজে খুব ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থান না হলেও উঁচু শ্রেণির শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে তাদের একটা অস্তিত্ব এখনো আছে। হিন্দু সমাজের যারা ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার থেকে মুক্তির প্রত্যাশা করতেন মূলত তারাই আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজে। কারণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চেতনায় যারা ছিলেন এগিয়ে তারা বুঝতেন রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা-আদর্শ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে রেনেসাঁসের কথা আমাদের গবেষকরা বলে থাকেন, এতেও এই ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৩–১৮৮৪), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭–১৯১৯), কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১), জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮–১৯৩৭), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১–১৯৪৪), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০–১৯২৫), যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫–১৯৩৭), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮–১৯৩২) প্রমুখ বাংলার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বাসী। অনেকের ভুল ধারণা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু। না, তিনি হিন্দু ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর সমস্ত পরিবার ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী। তাঁরা দেব-দেবীর পূজা করতেন না। তাঁরা ছিলেন রাজা রামমোহনের চিন্তার বিশ্বাসে একেশ্বরবাদী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আর রামমোহনের চিন্তাকে পাশাপাশি রেখে একজন পাঠক অতি সহজে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মর্ম বুঝতে

পারেন। কারণ, কবির ওপর রামমোহনের চিন্তার প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। এই প্রভাবের কথা স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেছেন তাঁর এক কবিতায়—

হে রামমোহন আজি শতকের বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহা চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নয়, তাঁর পরে আধুনিক বাংলা কবিতায় যিনি সবচেয়ে শক্তিমান কবি, সেই জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর পরিবার ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী। বাঙালিদের মধ্যে আরো আছেন অসংখ্য খ্যাতিমান নারী ও পুরুষ, যারা ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বাসী।

শাস্ত্রীয় বিধান অমান্য করে রামমোহন রায়ের কালাপানি অতিক্রম

রামমোহন রায় 'রাজা' হয়েছেন দিল্লির শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর কর্তৃক উপাধি লাভের মধ্যদিয়ে। তখন ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের রাজ। ব্রিটিশ রাজে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন নামমাত্র সম্রাট। তবে ভাতা পেতেন সরকারের কাছ থেকে। ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী সম্রাট ভাতা পাচ্ছিলেন না বলে বিষয়টি সমাধানের জন্য রামমোহন রায়কে বিলেত যাওয়ার প্রস্তাব করেন। বাংলা থেকে ইংল্যান্ড যেতে সাত সমুদ্র-তেরো নদী অতিক্রম করতে হয়। সমুদ্রের জলকে তখন হিন্দুসমাজে বলা হতো কালাপানি। আঠারো-উনিশ শতকের ইতিহাসে দেখা যায়, বাঙালি হিন্দুদের কালাপানি অতিক্রম শাস্ত্রীয়ভাবে অবাঞ্ছিত এবং নিষিদ্ধ ছিল। সম্রাটের ভাতায় অংশীদারিত্বের চুক্তিতে রাজা রামমোহন রায় এই শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর বিলেতের পথে যাত্রা শুরু করেন। রাজা রামমোহন রায় বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি শাস্ত্রীয় বিধান অমান্য করে কালাপানি পাড়ি দিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। শেকড় সন্ধানী

গবেষক গোলাম মুরশিদের মতে— শাস্ত্রীয় আইন অমান্য করে প্রথম কালাপানি পাড়ি দিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন ফারসি ব্যাকরণের লেখক 'ঘনশ্যাম দাস'। তিনি গিয়েছিলেন রাজা রামমোহনের ষাট বছর আগে। ঘনশ্যাম দাস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে একটি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বলে গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেন। সেদিন ঘনশ্যাম দাস সিলেক্ট কমিটির সামনে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা থেকে আমরা সেই সময়ের বাঙালি হিন্দুদের কাছে কালাপানি অতিক্রম কতটুকু শাস্ত্রীয় অপরাধ ছিল, তা কিছুটা বুঝাতে পারি। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, নন্দকুমারকে ইংল্যান্ড আসতে বললে আসবেন কি না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'নন্দকুমার ব্রাহ্মণ, তাই তাঁর পক্ষে কালাপানি পাড়ি দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। হিন্দুরা কেউ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাঁরা জাতিচ্যুত হন। সুতরাং তাঁকে বাধ্য না করলে তিনি আসবেন না। সিলেক্টর কমিটি জানতে চাইলেন—জাত গেলে প্রতিকারের পথ আছে কি না? ঘনশ্যাম দাস বলেন—দেশে ফিরে অর্থদণ্ড আর প্রায়শ্চিত্ত করলে জাত ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গোলাম মুরশিদ আরো লিখেছেন—ঘনশ্যাম দাস যখন দেশে ফিরে আসেন তখন অর্থদণ্ড দিয়ে ও গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন কি না, তার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন থেকে বুঝা যায় তিনি আর হিন্দু জাতে না থেকে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের সুপ্রিম কোর্টের এক সাক্ষীর নথিতে দেখা যায় তাঁর নাম Robert Ghansiam Doss. গোলাম মুরশিদ আরো বলেন—'বস্তুত ঘনশ্যাম দাস ছিলেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। তখন কালাপানি পার হওয়ার প্রতি জনমত এত প্রতিকূল ছিল যে সেই চাপ অগ্রাহ্য করে উনিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত অন্য কোনো খ্যাত বা অখ্যাত বাঙালি হিন্দু ইংল্যান্ডের পথে পা বাড়াতে পেরেছিলেন বলে কোনো তথ্য জানা যায় না। (গোলাম মুরশিদ, কালাপানির হাতছানি, প্রথম আলো, বিশেষ রচনা, ঈদ সংখ্যা ২০০৭)

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সেই সময়ে বাংলার হিন্দুসমাজে বিদেশ যাওয়াকে শুধু লোকাচার বিরোধী মনে করা হতো না, বরং এই কাজকে মনে করা হতো চরম দুর্ভাগ্য হিসেবে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিদেশ যাওয়াকে মৃত্যুর সমান দেখানো হয়েছে। তারপরও রাজা রামমোহন রায় বিদেশ ভ্রমণ করেন একাধিকবার। তিনি বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে কালাপানির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইংল্যান্ড যাওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি। রাজা রামমোহন রায় কতটুকু দুঃসাহসী মানুষ ছিলেন, তা আমরা তাঁর সময় আর

কর্মকে পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারব। যদিও রামমোহন রায় ইংল্যান্ড গিয়েছেন দিল্লির নামমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের কাজে, কিন্তু বিদেশের প্রতি তাঁর একটা আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। চিঠির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন দেশের মনীষীদের সাথে এক সময় গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই পরিচয়ের সূত্রে ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের একটি খসড়া সংবিধান তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। তাছাড়া আমেরিকার ইউনিটারিয়ান খ্রিষ্টান নেতাদের সাথে তাঁর প্রচুর যোগাযোগ ছিল। রামমোহনের ধার্মিকতার কথা গবেষকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন—তিনি নিঃসন্দেহে ধার্মিক ছিলেন। কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলছেন—তিনি জাত রক্ষায় ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। তিনি নাকি ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় দেশীয় গরু সাথে নিয়েছিলেন, যাতে দেশীয় গরুর দুধ খেয়ে জাত বাঁচানো যায়। গবেষক গোলাম মুরশিদ লিখেছেন—আমার মনে হয় না গরুর জাতিভেদে রামমোহন বিশ্বাস করতেন। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছু জাতিভেদ মেনে চলতেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন খাওয়ার পর অন্যদের সঙ্গে তিনি মদ্যপান করলেও, তিনি খেতেন তাঁর নিজের পাচকের রান্না। এ সবগুলোই শোনা কথা, অন্যরা লিখেছেন। সত্য হওয়াই সম্ভব, যদিও অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা হওয়া অসম্ভব নয়। অপরপক্ষে, যা নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তা হলো, হিন্দুধর্মে তাঁর বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য সবসময় তিনি পৈতা পরিহিত থাকতেন। এমনকি মারা যাওয়ার সময়ও তাঁর গলায় পৈতা ছিল। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৪)।

অবশ্য অনেক গবেষক শ্রদ্ধেয় গোলাম মুরশিদের সাথে দ্বিমত করে বলেছেন—'রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম প্রমাণে নয়, বরং ব্রাহ্মণ-জাত প্রমাণের জন্য পৈতা পরিহিত থাকতেন।' রাজা রামমোহন রায় ইংরেজদের ভোজন অনুষ্ঠানে গেলেও নিজের বাবুর্চির পাক করা খাদ্য গ্রহণ করে জাত রক্ষা করতেন বলে গবেষকরা লিখেছেন। কিন্তু ইংরেজদের খাদ্য গ্রহণ না করে তিনি যে খাদ্য গ্রহণ করতেন জাত রক্ষার্থে, ইতিহাসে দেখা যায় তা পাক করতেন একজন মুসলিম বাবুর্চি। এই বাবুর্চিকে তিনি ভারত থেকে সঙ্গে করে ইংল্যান্ড নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে এসে আশ্চর্য লাগে রামমোহনের জাত সচেতনতা বিষয়ে। মুসলিম যবনদের হাতের খাদ্য হিন্দু জাতের কাছে শাস্ত্রীয় মহাপাপ, আর রামমোহন সর্বদা সঙ্গে রাখতেন মুসলিম বাবুর্চি। এখন আমাদের প্রশ্ন—রাজা রামমোহন রায়ের জাতটা কী? আজীবন তাঁর গলায় পৈতা ছিল বলে আমরা মনে করতে পারি তিনি হিন্দু। কিন্তু পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তাঁর আজীবনের সংগ্রামকে কিংবা মুসলিম বাবুর্চির হাতের খাদ্য

গ্রহণকে, অথবা কালাপানির শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিলেত যাওয়াকে আমরা কোন জাতে নিয়ে পর্যালোচনা করব? আমরা মনে করি, রাজা রামমোহন রায় হিন্দু কিংবা ব্রাহ্মণ জাতের ভেতর জন্ম নিলেও গৌতম বৌদ্ধ, গুরুনানক প্রমুখের মতো স্বজাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন সত্য। তবে তাঁর ধর্মটা পৌত্তলিক ছিল না। তিনি কোনো প্রকার দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন না। এই দেব-দেবী আর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আজীবন সংগ্রাম।

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর সাথিদেরকে নিয়ে রাজা রামমোহন রায় অ্যালবিয়ন জাহাজে করে কালাপানি অতিক্রমের যাত্রা শুরু করেন। কেইপ হয়ে তিনি লিভারপুলে গিয়ে পৌঁছেন ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল। লিভারপুল হলো ইংল্যান্ডের তৎকালীন আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ সমুদ্রবন্দর এবং প্রাচীন শহর। রামমোহন রায় লিভারপুল পৌঁছলে সেখানের গণ্যমান্য অনেকে আসেন তাঁর সাথে দেখা করতে। আর তিনি দেখা করতে যান প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, দার্শনিক, কবি ও রাজনীতিক উইলিয়াম রস্কোর সাথে। রস্কো তখন খুব অসুস্থ ছিলেন এবং রামমোহনের সাথে সাক্ষাতের সাত সপ্তাহ পরে তিনি ৩০ জুন মারা যান। রামমোহনের আগে হিন্দুদের মধ্যে মাত্র একজন বিলেত গেলেও অনেক মুসলমান যাওয়ার কথা ইতিহাস স্বীকার করে। রামমোহনের আগে হিন্দু-মুসলিম ভারতীয় যারাই ইংল্যান্ড গেছেন তাদের কেউ ভালো ইংলিশ জানতেন না, তারা গিয়েছিলেন মামলা কিংবা ভাষা শিখতে। তারা কোম্পানির পরিচালকদের কাছ থেকে টাকা সাহায্য কিংবা কর্জ নিতেন। অনেকে আবার দেউলিয়াও হয়েছেন। অনেকের হয়েছে সামাজিক কেলেঙ্কারি। এক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন অন্য জগতের মানুষ। তিনি যেমন ছিলেন পণ্ডিত, দার্শনিক তেমনি ছিল তাঁর অসাধারণ ভাষাজ্ঞান। সম্রাটের ভাতা বৃদ্ধির কাজেও তিনি বিরাট কৌশল অবলম্বন করেন। প্রথমে চুক্তি সম্পর্কিত একটি বই প্রকাশ করেন এবং তা কোম্পানির কাছে জমা দেন। এভাবে বলতে গেলে তিনি কোম্পানিকে প্রায় ব্ল্যাকমেইল করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। ইংল্যান্ড থেকেও তাঁর কিছু বই প্রকাশিত হয়। দশ দিনের মতো তিনি লিভারপুলে ছিলেন। লিভারপুল থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে ম্যানচেস্টারে তাঁর সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করা হলে মানুষের এত ভিড় হয় যে শেষ পর্যন্ত তাকে বের করে আনতে পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। স্থানীয়দের কেউ কেউ ভেবেছেন তাঁকে ভারতের রাজা, আর কেউ পোশাক দেখে ভেবেছেন টিপু সুলতান। যদিও টিপু সুলতান অনেক আগেই শহিদ হয়েছেন। লন্ডন ইউনিভার্সিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম ছিলেন রামমোহনের কলম বন্ধু। রামমোহন লন্ডন পৌঁছার সাথে সাথেই বেন্থাম আসেন তাঁর সাথে

দেখা করতে। পরের বছর বেস্থাম মারা যান। রবার্ট ওয়েন, জেমস মিলার, উইলিয়াম গডউইন প্রমুখ ঐতিহাসিক ও দার্শনিদের সাথে ছিল রামমোহনের গভীর সম্পর্ক। ইংল্যান্ডে তাঁর যোগাযোগ হয় ইউনিটারিয়ান খ্রিষ্টানদের সাথে, যারা অন্যান্য খ্রিষ্টানদের মতো ঈশ্বরের ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন না, তারা রাজা রামমোহনের মতো একেশ্বরবাদী। একেশ্বরবাদী আদর্শের কারণে তিনি ইউনিটারিয়ান খ্রিষ্টানদেরকে খুব আপন ভাবতেন। ব্রিটেনের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের অভিষেকে কোম্পানির পরিচালকেরা তাকে দূতের মর্যাদা না দিলেও বসিয়েছিল বিভিন্ন দেশের দূতদের সাথে। এই অনুষ্ঠানে রাজার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় তিনি পণ্ডিত হিসেবে ফ্রান্সে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্স সফরে গেলে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ তাঁকে বিশেষ সমাদর করে একাধিকবার ভোজে নিমন্ত্রণ করেন।

এই গ্রহ ছেড়ে রাজা রামমোহন রায়ের চলে যাওয়া

১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের কথা। ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে রামমোহন বিরাট অর্থ-সংকটে পড়ে যান। এর কারণ হিসেবে ঐতিহাসকরা লিখেছেন—তিনি টাকা প্রেরণের জন্য যে ব্যাংককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা অর্থ-সংকটের কারণে এই দায়িত্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বন্ধুনির্ভর হয়ে পড়েন এবং কোম্পানির কাছ থেকে দুহাজার পাউন্ড কর্জ করার কথাও চিন্তা করেন। এমনি অভাবের দিনে তিনি তাঁর ইউনিটারিয়ান বন্ধু ল্যান্ট কার্পেন্টারের আমন্ত্রণে ব্রিস্টলে যান এবং দলসহ ল্যান্টের কন্যা ম্যারির আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলের শহরতলি স্টেপলটনের বিচ হাউসে 'ম্যানেনজাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজা রামমোহন রায় মারা যান। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে তাঁর সমাধিস্থল রয়েছে।

রাজা রামমোহন রায়ের সৃষ্টিকর্ম

আমরা এতক্ষণ রাজা রামমোহন রায়ের জীবন, কর্ম এবং চিন্তা সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে চেষ্টা করলাম। আরো বিস্তারিত ধারণা পাবো আমরা তাঁর লেখার ভেতর হাঁটলে। তাঁর গদ্য কিংবা পদ্য পড়লে মনে হয় না তিনি সাহিত্যের প্রয়োজনে সাহিত্যচর্চা করেছেন। তাঁর সাহিত্যচর্চা মূলত সংস্কারের প্রয়োজনে,